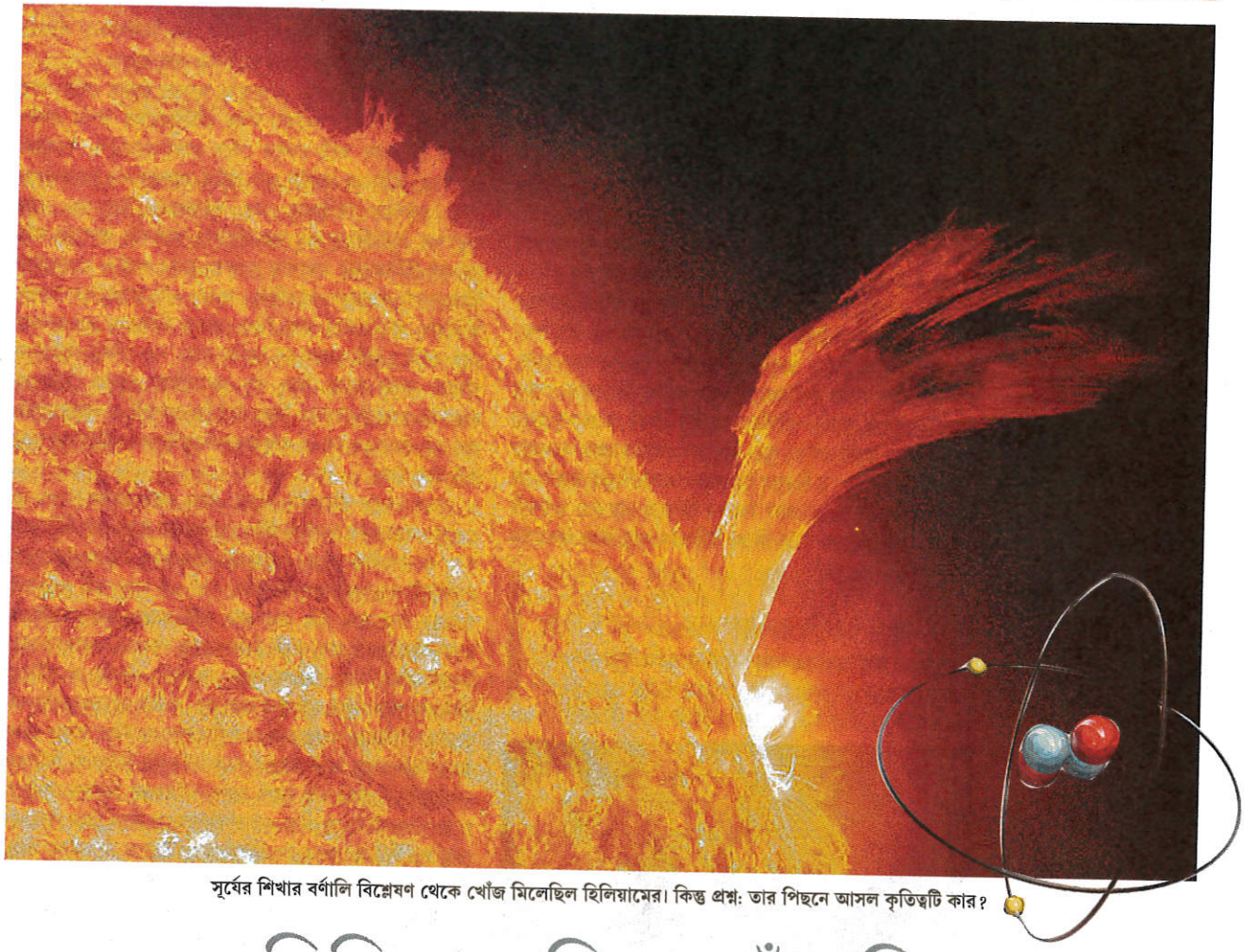

সূর্যের শিখার বর্ণালি বিশ্লেষণ থেকে খোঁজ মিলেছিল হিলিয়ামের। কিন্তু প্রশ্ন: তার পিছনে আসল কৃতিত্বটি কার?

হিলিয়াম নিয়ে হেঁয়ালি

বি মা ন না থ

'সোনার কেল্লা' ছবিতে সিধুজ্যাঠা ফেলুদাকে প্রশ্ন করলেন, উইলিয়ম জেম্‌স হার্শেল কে ছিলেন? ফেলুদা উত্তর দিলেন, ইনি একসময় বাংলাদেশের আই সি এস অফিসার ছিলেন, ১৮৮০ সালে 'নেচার' পত্রিকায় মানুষের আঙুলের ছাপের বিশেষত্ব নিয়ে একটি চিঠি লেখেন। সেই থেকেই আঙুলের ছাপ নেওয়ার চল। সিধুজ্যাঠা যদি এই ভদ্রলোকের পরিচয় নিয়ে আরও কিছু জিজ্ঞেস করতেন তাহলে ফেলুদা হয়তো এ-ও বলে দিতেন যে, ইনি ছিলেন ইউরেনাস গ্রহের আবিষ্কর্তা, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ স্যার ফ্রেডরিক উইলিয়ম হার্শেল-এর নাতি।

সিধুজ্যাঠা চাইলে এর পর আরও প্রশ্ন তুলতে পারতেন। যেমন, এই জেম্‌স হার্শেলের ছোট ভাই তখন ভারতে বসে কী করছিলেন? ফেলুদা এর কী উত্তর দিতেন জানি না, তবে এর সূত্র ধরে আর-একটা গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়তে পারতেন অনায়াসে। কারণ, এতে কোনও খলনায়ক না থাকলেও এর সঙ্গে ইতিহাসের, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ইতিহাসের অদ্ভুত একটা ধাঁধার সম্পর্ক আছে।

হিলিয়াম আবিষ্কারের এই গল্পে কোনও খলনায়ক না থাকলেও এর সঙ্গে ইতিহাসের, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ইতিহাসের অদ্ভুত একটা ধাঁধার সম্পর্ক আছে।

হিলিয়াম আবিষ্কারের গল্পে ফেলুদার কী ভূমিকা, তা নিয়ে পাঠক-পাঠিকা চিন্তায় পড়তে পারেন, তাই আগেই বলে রাখা ভাল যে, এই কাহিনিতে এমন সব চরিত্র আছে, আপাতদৃষ্টিতে যাঁদের সঙ্গে শুধু হিলিয়াম কেন, বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্কই থাকার নয়। যেমন, এই গল্পের এক অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেন এক সেনাপতি, মেজর ফ্রান্সিস টেনান্ট, যিনি একসময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে

সিপাহি বিদ্রোহের সময় দিল্লিতে লড়াই করেছিলেন। আবার এমন সব চরিত্রও আছেন, যাঁরা এই গল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অথচ যাঁদের নাম ইতিহাসের পাতা থেকে পুরোপুরি মুছে না গেলেও এই কাহিনিতে অবান্তর হয়ে গিয়েছেন।

চরিত্রের কথাই যদি ওঠে তবে বলতে হয়, হিলিয়াম গ্যাসের চরিত্র অন্যান্য নানা মৌলিক পদার্থের তুলনায় একটু বেশি রকমে আলাদা। মহাবিশ্বে মোট পরিমাপের দিক দিয়ে সব মৌলিক পদার্থের মধ্যে তার স্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে রয়েছে হাইড্রোজেন, মহাবিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ তা দিয়ে তৈরি। তার পরে আসে হিলিয়াম, যার পরিমাণ প্রায় এক-চতুর্থাংশের মতো। আর বাদবাকি সব পদার্থ মিলে এক শতাংশেরও কম।

কিন্তু মহাবিশ্বে এ ভাবে বিপুল পরিমাণে ছড়িয়ে থাকলে কী হবে, পৃথিবীতে হিলিয়ামের টিকি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এর কারণ হল দুটো। প্রথমত, হিলিয়াম খুব হালকা গ্যাস, ওজনের ব্যাপারেও হাইড্রোজেনের পরেই হিলিয়াম। আর হালকা হওয়ার দরুন পৃথিবীর মহাকর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা তার মধ্যে বেশি। আর দ্বিতীয়ত, হিলিয়ামের পরমাণুর গড়নটাই এমন যে সে নিজের ইলেকট্রনগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট। সে অন্য কোনও পরমাণুর সঙ্গে বিশেষ মিশতে চায় না। এমনকী নিজের জাতভাইদের সঙ্গে মিলে হিলিয়াম অণু গঠন করতেও

রয়্যাল সোসাইটি মেজর টেন্যান্ট-এর নেতৃত্বে একটি দল তৈরি করবে মনস্থ করল। শুধু বর্ণালি পরীক্ষা নয়, টেন্যান্ট ঠিক করলেন তিনি গ্রহণের সময় ক্যামেরায় সূর্যের ছবি তুলবেন। তখন দূরবিনে ক্যামেরা লাগিয়ে ছবি তোলা সবে শুরু হয়েছে।

হিন্ডেনবার্গ জেপেলিনে অগ্নিকাণ্ড

জানসেনকে কোনও ফরাসি দল নিমন্ত্রণ করল না, যদিও তাঁর কাছেই ছিল সবচেয়ে উন্নতমানের বর্ণালি মাপার যন্ত্র। ঠিক করলেন তিনি নিজেই ফরাসি অ্যাকাডেমি থেকে একটি অনুদান নিয়ে ভারতে যাবেন।

সে অপারগ। হাইড্রোজেন যদিও হালকা, কিন্তু সে বড় মিশুকে পরমাণু। বিশেষ করে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে জল তৈরি করে। তাই হাইড্রোজেন হালকা হলেও তার পিছুটান বেশি, সে নানা ধরনের যৌগিক পদার্থের মধ্যে জড়িয়ে আছে। আর হিলিয়ামের কোনও পিছুটান নেই, তাই পৃথিবীর জন্মের সময় তার ভাগে যতটুকু হিলিয়াম ছিল সেটা এতদিনে মহাকাশে উবে গেছে।

আমরা যে হিলিয়াম ব্যবহার করি সেটা আসে পৃথিবীর ভেতরের স্তরের ইউরেনিয়াম, থোরিয়ামের মতো পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার জন্য। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু থেকে নানা ধরনের কণা বেরয়। এদের মধ্যে যাকে আলফা কণা বলা হয় সেটা আসলে একটা হিলিয়াম পরমাণুকেন্দ্র— একটা হিলিয়াম পরমাণু থেকে তার ইলেকট্রনগুলো সরিয়ে দিলে যা পাওয়া যাবে সেটাই। সভাসদহীন রাজা আর কী! পৃথিবীর ভেতরের স্তর থেকে এইসব আলফা কণা বেরিয়ে সহজেই ইলেকট্রন জোগাড় করে হিলিয়াম পরমাণুর রূপ নেয়, আর মাটির তলার ফাঁকফোকরে জমা হয়। সাধারণত যেসব জায়গায় প্রাকৃতিক জ্বালানি গ্যাস পাওয়া যায়, সেখানে কিছু হিলিয়ামও থাকে। এইসব জায়গা থেকে হিলিয়াম জোগাড় করা হয়।

হিলিয়াম ভর্তি বেলুন আজকাল আমরা হরদম দেখি। গত বছর কমনওয়েলথ গেমসের সময় স্টেডিয়ামের ওপর একটা বিশাল হিলিয়াম ভর্তি বেলুন বেঁধে রাখা হয়েছিল। সাধারণ বেলুনেও হিলিয়াম ভরাটা খুব কঠিন ব্যাপার নয় আজকাল। কিন্তু একসময় হিলিয়াম এত সহজলভ্য ছিল না। গত শতাব্দির প্রথমদিকে শুধু আমেরিকার কয়েকটা গ্যাসের খনি থেকেই হিলিয়ামের জোগান আসত। যখন জার্মান জেপেলিন হিন্ডেনবার্গ বানানো হয়েছিল, তখন হাইড্রোজেনের বদলে হিলিয়াম ব্যবহারেরই কথা ছিল, কারণ হিলিয়াম খুব হালকা তো বটেই, হাইড্রোজেনের মতো দাহ্য নয়। কিন্তু হিলিয়াম পাওয়া তখন সহজ ছিল না। আমেরিকা থেকে হিলিয়াম রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। তাই হিন্ডেনবার্গ-এ হাইড্রোজেন ভরা হয়, আর ১৯৩৭-এ এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

তবে বেলুন ইত্যাদির মতো এমন করে চাক্ষুষ দেখা না গেলেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যাপারেই হিলিয়াম খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আজকাল চিকিৎসাজগতে ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং, বা এম আর আই সচরাচর ব্যবহার করা হয়। এই এম আর আই যন্ত্রের মূল চুম্বকটাকে ঠান্ডা করে রাখার জন্য তরল হিলিয়ামের দরকার। এছাড়া রকেট উৎক্ষেপণের জন্য অনেক সময় জ্বালানি রাখার অংশটিকে হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। গভীর জলের ডুবুরিদের জন্যেও হিলিয়াম অত্যাবশ্যক। গভীর সাগরে নিয়ে যাবার জন্য গ্যাস সিলিন্ডারে অক্সিজেনের সঙ্গে খানিকটা হিলিয়াম মিশিয়ে দেওয়া হয়, যাতে ওই প্রচণ্ড চাপে অক্সিজেন বিষাক্ত না হয়ে পড়ে। বোঝাই যাচ্ছে, গত এক শতাব্দি জুড়ে দিনে দিনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে হিলিয়াম, কিন্তু তার ইতিহাস নিয়ে সেই ধাঁধাটা রয়েই গেছে।

ইতিহাসের ধাঁধাটা হল এই— প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৬৮ সালে এক সূর্যগ্রহণের সময়, ফরাসি বিজ্ঞানী পিয়ের জুল জানসেন যখন ভারতে এসে গুন্টুর থেকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। প্রায় একই সময় ইংল্যান্ডের নরম্যান লকইয়ারও নাকি এই আবিষ্কার করেন। এই রকম একটি ঘটনার কথা মোটামুটি সব বিজ্ঞান বা ইতিহাসের বইয়ে লেখা আছে। বিভিন্ন এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতায়, এমনকী, বর্তমানে অনেকে যার কথা বেদবাক্য বলে মনে করেন, সেই উইকিপিডিয়াতেও। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় হিলিয়াম আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনায় ওপরের গল্পটিই বলা হয়েছে।

মজার কথা হল, এর প্রায় পুরোটাই ভুল। জানসেন আর যাই করে থাকুন না কেন, হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কার করেননি। আর নরম্যান লকইয়ারের সঙ্গে তাঁর যুগ্ম আবিষ্কারটি হিলিয়াম গ্যাস নিয়ে ছিল না, সেটি ছিল সূর্যের বাইরের অংশ পর্যবেক্ষণ করার এক বিশেষ পদ্ধতি বের করার জন্য।

কিন্তু এই ভুল গল্পটাই এখন প্রচলিত, একটি 'আরবান লেজেন্ড'-এর মতো আর কী! যদিও নরম্যান লকইয়ার ১৮৯৬ সালে, অর্থাৎ, গবেষণাগারে হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কারের একবছর পরই এই গবেষণার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস লিখেছিলেন। আর, সেটি তাঁর নিজের সম্পাদিত 'নেচার' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেটি কয়েকবছরের মধ্যে সকলে বেমালুম ভুলে যান। এমনকী, ১৯০৪ সালে যখন উইলিয়াম র‍্যামসে-কে হিলিয়াম এবং আরও কিছু গ্যাস আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, সেই পুরস্কার-বিতরণী সভায় সুইডিশ

ইন্টারনেটের দৌলতে এই মারাত্মক ভুলের পরিধি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। কারণ, এই কাট-অ্যান্ড-পেস্ট-এর যুগে কারও আর মূল সূত্রগুলো ফিরে দেখার সময় নেই। পুরনো নথির মধ্যে লেফটেন্যান্ট জন হার্শেলের লেখা রিপোর্টও রয়েছে, যিনি সেদিন অধুনা কর্নাটকের অন্তর্গত জামখান্ডি থেকে ওই সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই জন হার্শেলই হলেন সিধুজ্যাঠার প্রশ্নের জেমস হার্শেলের ছোট ভাই।

অ্যাকাডেমির সভাপতিও বলে ফেলেছিলেন, হিলিয়াম নাকি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ভারতে, জানসেন-এর পর্যবেক্ষণের সময়।

গত কয়েক বছরে কয়েকজন ইতিহাসবিদ এই ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করেছেন। ১৯৯৯ সালে ফরাসি পত্রিকা 'ল্য রশের্শ'-এ ডেভিড অব্যাঁ-র একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল: 'কী কারণে জানসেন হিলিয়ামের আবিষ্কর্তা নন'। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। যদিও পুরনো প্রবন্ধগুলো এখনও মোটামুটি সহজলভ্য, ইন্টারনেটের দৌলতে এই মারাত্মক ভুলের পরিধি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। কারণ, এই কাট-অ্যান্ড-পেস্ট-এর যুগে কারও আর মূল সূত্রগুলো ফিরে দেখার সময় নেই। পুরনো নথির মধ্যে লেফটেন্যান্ট জন হার্শেলের লেখা রিপোর্টও রয়েছে, যিনি সেদিন অধুনা কর্নাটকের অন্তর্গত জামখান্ডি থেকে ওই সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই জন হার্শেলই হলেন সিধুজ্যাঠার প্রশ্নের জেমস হার্শেলের ছোট ভাই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, যাঁর পর্যবেক্ষণের কথা এই কাহিনিতে সবচেয়ে বেশি করে থাকার কথা ছিল, সেই নরম্যান পোগসন-এর রিপোর্ট কখনও কোনও বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি বলে, প্রায় হারিয়েই গিয়েছে। কারণ, ব্রিটিশ বিজ্ঞানীমহলে তিনি খুব একটা জনপ্রিয় ছিলেন না। আর ক্ষুব্ধমনে যখন তিনি তাঁর রিপোর্টটি প্রকাশ করার জন্য তদ্বির করছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী মাদ্রাজে কলেরায় ভুগে প্রায় মরণাপন্ন। এখন তাঁকে নিয়ে খুব একটা আলোচনাও হয় না, যদিও জ্যোতির্বিদরা নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য মাপার জন্য যে একক ব্যবহার করেন, সেটাও এই বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞানীই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর স্মৃতি এভাবে মুছে না গেলে হয়তো গুস্টুর-এর বদলে মছলিপটনম-এর কথাই লোকে বলত। কারণ, পোগসন সেখান থেকেই সকলের আগে হিলিয়াম গ্যাসের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন।

গল্পটা প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। গ্রিক পণ্ডিতরা অনেক আগেই মৌলিক পদার্থ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন। এমপিডোক্লিস বলেছিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ আসলে চারটি মৌলিক পদার্থ—মাটি, জল, হাওয়া এবং আগুন দিয়ে তৈরি। যে-কোনও জিনিসকে ভাঙলে দেখা যাবে, সেটি আসলে এই চারটি পদার্থের মধ্যে কয়েকটির মিশ্রণ। পরে অ্যারিস্টটল এর সঙ্গে যোগ করলেন একটি পঞ্চম 'ভূত', যা দিয়ে নাকি নক্ষত্রগুলো তৈরি। এর প্রায় দু'হাজার বছর পর, আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাতের সময় বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জানতে পারলেন, গ্রিকদের বর্ণনা করা মৌলিক পদার্থগুলো আসলে 'মৌলিক' নয়। বাতাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনেক ধরনের গ্যাস তাঁরা আবিষ্কার করলেন, যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি। অর্থাৎ বাতাস নয়, এই সব গ্যাস হল মৌলিক। একসময় রসায়নের সঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রবাহের বিজ্ঞান মিলিয়ে তাঁরা আরও নতুন কয়েকটি মৌলিক পদার্থ আলাদা করতে পারলেন, যেমন পটাশিয়াম। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় পঞ্চান্নটি মৌলিক পদার্থের কথা বিজ্ঞানীদের জানা ছিল।

তারপর ১৮৫৯ সালে রবার্ট বুনসেন আর গুস্তাভ কিরকফ-এর গবেষণা রসায়নবিজ্ঞানে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। তাঁরা পদার্থ থেকে বিকীর্ণ আলো দিয়ে সেই পদার্থ শনাক্ত করার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। প্রথমে তাঁরা দেখলেন যে, কোনও পদার্থ তপ্ত এবং গ্যাসীয় অবস্থায় যে-আলো ছড়ায়, তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ রং থাকে। আরও সঠিকভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেকটি পদার্থের আলোর বর্ণালির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। ঠিক যেমন মানুষের আঙুলের ছাপ দেখে তাকে চেনা যায়, বর্ণালির ধরন বা প্যাটার্ন দেখেও পদার্থকে শনাক্ত করা যায়। সবচেয়ে মজার কথা হল, কোনও পদার্থ যখন ঠান্ডা অবস্থায় তার উপর পড়া আলো শোষণ করে, তখন তার মধ্য দিয়ে আসা আলোর বর্ণালি হয় তার উত্তপ্ত অবস্থার বর্ণালির ঠিক নেগেটিভের মতো। তার উজ্জ্বল রঙিন আলোর জায়গায় ওই অংশগুলি কালো দেখায়।

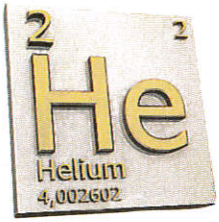

এই ধারণার সাহায্যেই কিরকফ সূর্যের বর্ণালি ব্যাখ্যা করেছিলেন। সূর্যের আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে পাঠালে রামধনু রং পাওয়া যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ফ্রাউনহফার নামে একজন বিজ্ঞানী লক্ষ করেছিলেন যে, খুব খুঁটিয়ে দেখলে এই রামধনু রঙের মধ্যে অসংখ্য কালো রেখা দেখা যায়। কিরকফ এর ব্যাখ্যা করলেন এভাবে: সূর্যের সাদা আলো তৈরি হচ্ছে তার তপ্ত গভীর স্তরগুলোয়। এই আলো যখন বাইরের অপেক্ষাকৃত শীতল গ্যাস পেরিয়ে আসে, তখন ওই গ্যাস কিছু আলো শোষণ করে নেয় বলে এই কালো দাগগুলো তৈরি হয়।

১৮৬৮ সালে সূর্যে এই অপার্থিব গ্যাসের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে, সূর্যের গ্রিক শব্দ 'হিলিওস' থেকে নরম্যান লকইয়ার এর নামকরণ করেন হিলিয়াম।

কিরকফ বললেন যে, গবেষণাগারে দেখা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বর্ণালির রেখার সঙ্গে এই কালো দাগগুলো মিলিয়ে দেখলে সূর্যে কী কী গ্যাস আছে তা শনাক্ত করা যেতে পারে। আর শুধু সূর্য কেন, যে-কোনও নক্ষত্রের আলোর বর্ণালি পরীক্ষা করলে সেই নক্ষত্র কী দিয়ে তৈরি, তা-ও জানা সম্ভব। তাই এই সূত্র ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক নতুন ধারার গবেষণার পথ খুঁজে পেলেন। আগে ছিল নক্ষত্রের অবস্থান নিয়ে অঙ্ক কষা— যাকে বলে পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি। এবার শুরু হল নক্ষত্রের উপাদান নিয়ে গবেষণা।

অবশ্য সেই সব বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। এর একটা কারণ হল, তখনকার দিনের প্রত্যক্ষবাদী (পজিটিভিস্ট) দর্শন। এই দর্শনের মতে, কিছু প্রশ্ন সব সময়ই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে থেকে যাবে। এর উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছিল যে, নক্ষত্র যেহেতু মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাই সে কী দিয়ে তৈরি, এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাওয়া যাবে না। অনেক বিজ্ঞানীও এই বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তাই বিজ্ঞানের এই নতুন বিষয় অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা শুরুতে একধরনের শখের বিজ্ঞানী ছিলেন। যেমন, লন্ডনের এক সিল্ক ব্যবসায়ী উইলিয়াম

সূর্যের বর্ণালিতে ফ্রাউনহফার আবিষ্কৃত কালো দাগ

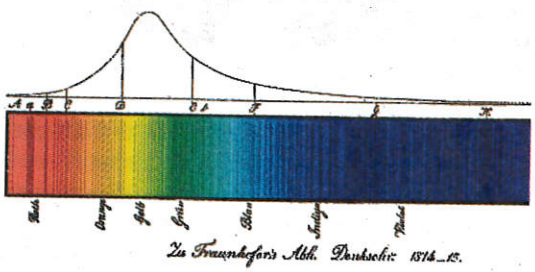

বহু বছর পর লকইয়ার তাঁর ১৮৯৬ সালে লেখা প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, পোগসনের রিপোর্টের একটা লাইন তাঁকে খুব ভাবিয়েছিল। সেটা হল, হলুদ রেখাটা সোডিয়ামের চিহ্ন না-ও হতে পারে। অবশ্য পোগসনের সেই রিপোর্ট কোনও বিজ্ঞান-জার্নালে প্রকাশিত হয়নি, যদিও অন্য সকলের কথা প্রকাশ করা হয়েছিল। পোগসন যখন তাঁর রিপোর্ট লিখে নিজের উদ্যোগে মাদ্রাজে ছাপানোর ব্যবস্থা করছিলেন।

হাগিন্স, যিনি কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে নিজের বাড়ির বাগানে একটি মানমন্দির তৈরি করে, নক্ষত্রের বর্ণালির গবেষণায় মেতে উঠলেন। আর ছিলেন ভ্যাটিকানের এক জেসুইট পাদ্রি অ্যাঞ্জেলো সেচ্চি, যিনি ফরাসিরা রোম দখল করার সময় আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানে হাতেখড়ি নিয়ে পরে রোমে ফিরে এসে নক্ষত্রের বর্ণালি গবেষণায় নেমে পড়েছিলেন।

যেমন, নরম্যান লকইয়ার। তিনি প্রথমে ছিলেন লন্ডনের সামরিক অফিসের একজন সাধারণ কেরানি। একবার বাড়ি বদলের সময় তাঁর প্রতিবেশী, এক শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানীর একটি দূরবিনে চোখ রাখার পর থেকে তাঁর জীবন একেবারে অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে চাঁদ আর মঙ্গলগ্রহের ওপর কিছু নজরকাড়া গবেষণার সুবাদে রাতারাতি নাম করে ফেলেছিলেন তিনি।

এরকমই একজন হলেন ফ্রান্সের পিয়ের জুল জানসেন। ছোটবেলায় এক দুর্ঘটনার জন্য ভাল করে স্কুলে পড়াশোনা করতে পারেননি। শৈশবে একবার আয়ার কোল থেকে পড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যান জানসেন, সারাজীবন তাঁকে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়েছিল। যদিও তিনি ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতেন যে, বড় হয়ে প্যারিস মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী হবেন, তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবে জানসেন তাতে মোটেই দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। নিজেই আলোর বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করার এমন একটা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, যেটা সেই সময়ের সেরা যন্ত্র ছিল। এমনকী, স্বয়ং পাদ্রি সেচ্চিও তাঁকে রোমে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর যন্ত্রটা একবার দেখার জন্য।

নরম্যান লকইয়ার

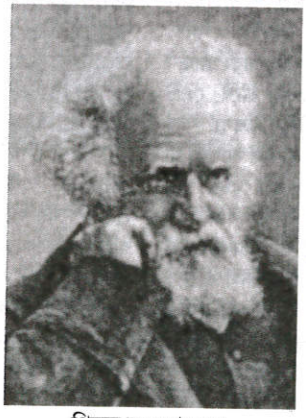

পিয়ের জুল জানসেন

পোগসন মাদ্রাজে বসে সব খবরই পাচ্ছিলেন, কীভাবে রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে অবহেলা করে মেজর টেন্যান্টের হাতে আধুনিক সব যন্ত্রপাতি পাঠাচ্ছেন। কিন্তু তিনিও জানসেনের মতো দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না।

তখন বিজ্ঞানীরা ভাবছিলেন, কীভাবে কিরকফের ধারণার সত্যতা প্রমাণ করা যায়। সকলের মাথায় একটি ধারণাই ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, যদি সূর্যের বর্ণালির কালো দাগগুলি তার বাইরের স্তরে তৈরি হয়, তা হলে কিরকফের নিয়ম অনুযায়ী ওই বাইরের গ্যাস থেকে বিকীর্ণ হওয়া আলোর বর্ণালিতে কালো দাগের জায়গায় উজ্জ্বল আলোর রেখা থাকা উচিত। কারণ, সেই গ্যাসও কিছুটা আলো বিকিরণ করছে এবং তার বাইরে কোনও শীতল পদার্থ নেই আলো শোষণ করার। কারণ, সেটাই হল সবচেয়ে বাইরের স্তর। কিন্তু শুধু ওই বাইরের অংশের আলো কী করে দেখা যেতে পারে? সূর্যের মূল অংশের আলো তো আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়!

একটি উপায় হল সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের বাইরের অংশের বর্ণালি পরীক্ষা করা। কিন্তু সেজন্য কে সূর্যগ্রহণের সময় ওত পেতে বসে থাকবে আর যন্ত্রপাতি নিয়ে পৃথিবীর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবে? তবুও একদল বিজ্ঞানী এই সূর্যগ্রহণের পিছনে ধাওয়া করার একটি পদ্ধতি বেছে নিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন জানসেন। তিনি পঙ্গু হলে কী হবে, যেহেতু তাঁর কোনও স্থায়ী চাকরি ছিল না, তাই বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুদান নিয়ে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতে, পরে আল্পস-এ গিয়েও নানাধরনের গবেষণা করেছেন। তাঁকে ভবঘুরে বিজ্ঞানী বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

আবার ইংল্যান্ডের হাগিন্স এবং লকইয়ারের মতো বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন, যদি সূর্যগ্রহণ ছাড়াই সূর্যের বাইরের অংশটার আলো ছেঁকে নেওয়া যায়। এই সময় বিজ্ঞানীরা লক্ষ করলেন যে, সূর্যের বাইরের স্তরে অহরহ তুমুল ঝড় উঠছে এবং ওই আগুনের লেলিহান শিখার দিকে তাঁদের দূরবিন তাক করার চেষ্টা করলেন। তাঁরা চেষ্টা করছিলেন, যাতে সূর্যের আলোর রংগুলো যথেষ্ট ছড়িয়ে দেওয়া বা বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া যায়। তা হলে সূর্যের রামধনু বর্ণালির ঔজ্জ্বল্য কিছুটা কমে যাবে। কিন্তু এই বিক্ষেপের ফলে সূর্যের বাইরের অংশের আলোর বর্ণালির উজ্জ্বল রেখাগুলো ম্লান হবে না, এরকমই ছিল তাঁদের আশা। যেমন, কুলো দিয়ে চাল থেকে তুষ আলাদা করার সময় যা হয়, অর্থাৎ হাওয়ার ধাক্কায় হালকা তুষ উড়ে যায় কিন্তু ভারী চাল যেমন আছে, তেমনই থাকে। কিন্তু তার জন্য বর্ণালি পরীক্ষায় যে-ধরনের শক্তিশালী যন্ত্র দরকার, তা কারও কাছে ছিল না।

এমন সময় ১৮৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক লেফটেন্যান্ট (পরে মেজর) ফ্রান্সিস টেন্যান্ট-এর লেখা একটি বিজ্ঞান-প্রবন্ধ বিজ্ঞানীমহলে আলোড়ন তুলল। সৈন্যদলে নাম লেখালেও আসলে তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার, বেশিরভাগ সময়ই জরিপের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এই জরিপের কাজ করতে-করতে কখন যেন দূরবিন নিয়ে নাড়াচাড়া করা তাঁর নেশা হয়ে গেল এবং ১৮৫৬ সালে করাচির অক্ষাংশ মাপার সময় তিনি দূরবিনের ওজন ব্যালান্স করার একটি নতুন ডিজাইন আবিষ্কার করেন, যা পরবর্তীকালে অনেক মানমন্দিরে ব্যবহার করা হয়েছিল। অবশ্য ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় তাঁকে বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে দিল্লির লাহৌর গেটে যুদ্ধে নামতে হয়। তারপর অবশ্য লখনউতে গিয়ে সেখানকার রেসিডেন্সি রক্ষা করার সময় নবাবের মানমন্দিরে ঢুকে তাঁর দূরবিন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পান। এরপর তাঁর আর মন টিকল না সৈন্যদলে, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মাদ্রাজের মানমন্দিরের অধিকর্তা হয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েই পড়ে রইলেন।

এই সময় তিনি হঠাৎ লক্ষ করলেন যে, ১৮৬৮ সালের ১৮ আগস্টে আসন্ন সূর্যগ্রহণের পথ ভারতের ওপর দিয়ে যাবে এবং এই পূর্ণগ্রহণটি হবে পাক্কা ছ'মিনিটের মতো, যেটা গড়পড়তা

সূর্যগ্রহণের তুলনায় অনেক বেশি। এই সময়টি যদি হাতে পাওয়া যায়, তা হলে নিশ্চয় সূর্যের আলোর বর্ণালি নিয়ে যেসব পরীক্ষার কথা বিজ্ঞানীরা ভাবছিলেন, সেগুলো করা সম্ভব হবে। টেন্যান্ট দেরি না করে ভারতের কোথা থেকে, কীভাবে এই গ্রহণ দেখা যাবে, তা অঙ্ক কষে একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই রিপোর্ট পড়ে ইউরোপের বিজ্ঞানীদের মধ্যে পড়ে গেল সাজ-সাজ রব।

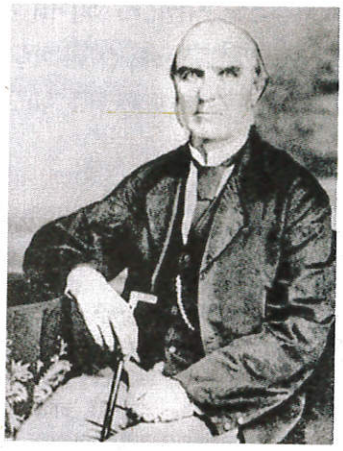

নরম্যান পোগসন

ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি মেজর টেন্যান্ট-এর নেতৃত্বে একটি দল তৈরি করবে মনস্থ করল। শুধু বর্ণালি পরীক্ষা নয়, টেন্যান্ট ঠিক করলেন তিনি গ্রহণের সময় ক্যামেরায় সূর্যের ছবি তুলবেন। তখন দূরবিনে ক্যামেরা লাগিয়ে ছবি তোলা সবে শুরু হয়েছে। ১৮৬০ সালে ইতালিতে একটি সূর্যগ্রহণের সময় প্রথম ফোটোগ্রাফ তোলা হয়। টেন্যান্টের নেতৃত্বে ক্যামেরায় ফিল্ম লাগানো থেকে শুরু করে, ঠিক সময় অ্যাপারেচার খুলে রাখা তারপর আবার ফিল্ম ভরা— এই সবের রিহার্সাল চলল সামরিক কায়দায়, যাতে ছ'মিনিটে অন্তত পাঁচ-ছ'টি ছবি তোলা যেতে পারে। সবচেয়ে ভয় ছিল আগস্ট মাসে বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে। টেন্যান্ট ঠিক করলেন অন্য জায়গাগুলোর মধ্যে অন্ধ্রের গুন্টুর অপেক্ষাকৃত শুকনো এবং সেখান থেকে পর্যবেক্ষণ করাই ঠিক হবে।

এ ছাড়া হার্শেল পরিবারও এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন, তা আগেই লিখেছি। ইউরেনাসের আবিষ্কর্তা ফ্রেডরিখ হার্শেলের ছেলে জন হার্শেল সেই সময়ের একজন নামী জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর ছোট ছেলে, তাঁর নামও ছিল জন হার্শেল, জরিপের কাজে বাঙ্গালোরে নিযুক্ত। তিনি তাঁর ওপর ওই দিনের সূর্যের বর্ণালি পরীক্ষা করার দায়িত্ব দিলেন।

ফরাসি বিজ্ঞানীরা ভারতবর্ষের বদলে শ্যামদেশে (বর্তমানে তাইল্যান্ড) তাঁদের দল পাঠাবেন ঠিক করলেন। সেখানকার রাজা মংকুট এমনিতেই জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। পাছে বর্বর বলে তাঁর রাজত্বও এরা দখল করে নেয়, তাই গ্রহণকে উপলক্ষ করে সকলকে, বিশেষ করে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীদের তিনি দেখাতে চাইছিলেন যে, তাঁর দেশের লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। কিন্তু জানসেনকে কোনও ফরাসি দল নিমন্ত্রণ করল না, যদিও তাঁর কাছেই ছিল সবচেয়ে উন্নতমানের বর্ণালি মাপার যন্ত্র। ঠিক করলেন তিনি নিজেই ফরাসি অ্যাকাডেমি থেকে একটি অনুদান নিয়ে ভারতে যাবেন, এবং যাবেন গুন্টুর-এই— যে-জায়গাটি টেন্যান্টও বেছেছিলেন। গুন্টুর-এ কয়েকজন ফরাসি ব্যবসায়ী ছিলেন, যাঁরা তামাকের ব্যবসা করতেন। জানসেন এরকমই এক ব্যবসায়ী মসিয়ঁ ল্য ফশ্যর-এর সন্ধান পেলেন, যাঁর বাড়ি ছিল ওই তল্লাটে সবচেয়ে উঁচু অর্থাৎ, দূরবিন বসানোর পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত। টেন্যান্টের দল ছিল সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে, গুন্টুরের সহকারী কালেক্টরের বাড়ির বাগানে।

এদিকে তখন মাদ্রাজের মানমন্দিরের নতুন অধিকর্তা হয়ে এসেছিলেন নরম্যান রবার্ট পোগসন। তাঁর জন্ম হয়েছিল এক গরিব পরিবারে। নিজের উদ্যোগেই জ্যোতির্বিজ্ঞান শিখে তিনি বিভিন্ন মানমন্দিরে কাজ করছিলেন। বিয়ের পর একটা ভাল চাকরির খোঁজ করছিলেন, এমন সময় তাঁকে ভারতে কাজ করার একটা সুযোগ দেওয়া হয়। তবে তিনি কখনও ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের নেকনজরে আসতে পারেননি। কারণ, অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের কোনও ডিগ্রি ছিল না তাঁর। অথচ ওই বয়সেই নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য মাপার 'ম্যাগনিচিউড' এককটি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন।

ভারতে পৌঁছে পোগসন বেতন নিয়ে নালিশ করতে শুরু করেছিলেন। এতে রয়াল সোসাইটির সভাপতি জর্জ এইরি তাঁর ওপর রেগে গিয়েছিলেন। পোগসন অবশ্য মাদ্রাজে এসেই কয়েকটি নতুন গ্রহাণু (অ্যাস্টেরয়েড) আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু এখানকার পরিবেশ, আবহাওয়া এবং সহকারীদের অকর্মণ্যতায় তিনি ভীষণ বিরক্ত হতেন। তাঁর সেই সময়ের রোজনামচায় নানা ব্যঙ্গাত্মক লেখা দেখা যায়, যেমন,

> নরম্যান পোগসন-এর রিপোর্ট কখনও কোনও বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি বলে, প্রায় হারিয়েই গিয়েছে। যদিও জ্যোতির্বিদরা নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য মাপার জন্য যে একক ব্যবহার করেন, সেটা এই বিস্মৃতপ্রায় বিজ্ঞানীই আবিষ্কার করেছিলেন।

'ভারতে এসে আমাদের বাড়ির চত্বরেই প্রথম পর্যবেক্ষণ শুরু করলাম, চারদিকের সাপখোপ আর বিছের মতো বিপজ্জনক প্রাণীদের ছোটাছুটির মাঝখানে নির্বিকার হয়ে, নির্ভীকচিত্তে দাঁড়িয়ে।' একজন সহকারীর কথা বাদ দিলে (রঘুনাথাচারী, যিনি তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং পরে রয়্যাল সোসাইটির সদস্যও হয়েছিলেন), বাকিরা তাঁর মতে ছিল আহাম্মক ('ডোল্ট')। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা তাঁর রিপোর্টগুলো না পড়েই রেখে দিতে শুরু করলেন, উত্তর দেওয়া তো দূরস্থান।

পোগসন মাদ্রাজে বসে সব খবরই পাচ্ছিলেন, কীভাবে রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে অবহেলা করে মেজর টেন্যান্টের হাতে আধুনিক সব যন্ত্রপাতি পাঠাচ্ছেন। কিন্তু তিনিও জানসেনের মতো দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। মাদ্রাজ রেলওয়ের টেলিগ্রাফ অফিসের একজন ইঞ্জিনিয়ার আর একজন সরকারি অফিসারকে তিনি সঙ্গে নেবেন ঠিক করলেন। মাদ্রাজ পূর্তবিভাগের সাহায্যে একটি দূরবিনের ব্যবস্থাও করলেন। লন্ডনের সেই প্রাক্তন সিল্ক ব্যবসায়ী উইলিয়াম হাগিন্সকে অনুরোধ করে, বর্ণালি মাপার একটি নতুন যন্ত্রও আনিয়ে নিলেন। লোকজন নিয়ে যাওয়ার জন্য টাকাপয়সা জোগাড় করার অসুবিধে? কুছ পরোয়া নেই, মনে-মনে একটি ফন্দি আঁটলেন। ১৮৬৪ সালে বিধ্বংসী এক ঘূর্ণিঝড়ে মছলিপটনমে খুব ক্ষতি হয়েছিল, তারপর সেখানে একটি আবহাওয়া অফিস খোলার কথা হচ্ছিল, যার ভার দেওয়া হয়েছিল পোগসনের ওপর। পোগসন দেখলেন, এক ঢিলে দুই পাখি মারার এই সুযোগ — মছলিপটনমে আবহাওয়া মাপার কয়েকটি যন্ত্রপাতি বসানো হবে, সেই সঙ্গে সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করাও হবে।

গ্রহণের দিন জানসেন সূর্যের বাইরের আলোকিত অংশের বর্ণালিতে দেখলেন যে, কালো দাগের জায়গায় কয়েকটি উজ্জ্বল আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, কিরকফের ধারণা সত্যি হলে ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। সূর্যের মূল অংশটি ঢেকে গিয়েছে, কিন্তু বাইরের তপ্ত অংশের আলো শোষণ করার কোনও গ্যাস নেই, তাই কোনও কালো দাগ নেই।

বিজ্ঞানের এই নতুন বিষয় অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা শুরুতে একধরনের শখের বিজ্ঞানী ছিলেন।

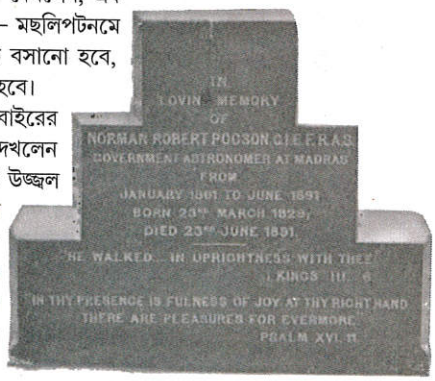

চেন্নাইতে নরম্যান পোগসনের সমাধিফলক

ওপর দিয়ে যাবে এবং এই পূর্ণগ্রহণটি হবে পাক্কা ছ'মিনিটের মতো, যেটা গড়পড়তা সূর্যগ্রহণের তুলনায় অনেক বেশি। এই সময়টি যদি হাতে পাওয়া যায়, তা হলে নিশ্চয় সূর্যের আলোর বর্ণালি নিয়ে যেসব পরীক্ষার কথা বিজ্ঞানীরা ভাবছিলেন, সেগুলো করা সম্ভব হবে।

এবার ওই উজ্জ্বল রেখাগুলোর রং (অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য) মেপে সূর্যের বাইরের অংশে কী কী গ্যাস আছে, সেটা বলা সম্ভব। জানসেন দেখলেন যে, হাইড্রোজেন ছাড়াও সোডিয়ামের চিহ্নস্বরূপ একটি হলুদ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। টেন্যান্ট, হার্শেল সকলেই এই হলুদ রেখাকে সোডিয়াম বলে শনাক্ত করলেন।

শুধু মছলিপটনমে বসে পোগসনের মনে এই হলুদ রেখার সঠিক অবস্থান নিয়ে সন্দেহ হয়েছিল। তিনি তাঁর নোট-এ লিখেছিলেন যে, রেখাটি সোডিয়ামের চিহ্ন না-ও হতে পারে। যদি এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সোডিয়াম থেকে ভিন্ন হয়, তা হলে সেটি হবে নতুন কোনও গ্যাসের চিহ্ন। আসলে এটিই ছিল হিলিয়ামের চিহ্ন এবং অন্য সকলে ভুল করলেও পোগসনের মনে খুঁতখুঁতুনি থেকে গিয়েছিল।

গ্রহণের পর টেন্যান্ট এবং অন্যরা যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে ফিরে চলে গেলেও জানসেন থেকে গিয়েছিলেন গুন্টুরে। সেই দিনই তাঁর মাথায় একটি আইডিয়া এসেছিল। সেটি হল, হয়তো গ্রহণের পরও সূর্যের বাইরের অংশের বর্ণালি দেখা যেতে পারে, যা দেখার জন্য লকইয়ার উসখুস করছিলেন এবং যার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র জানসেনের হাতের কাছেই আছে। এর জন্য দরকার শুধু সূর্যের বাইরে ওঠা ঝড়কে ভাল করে লক্ষ করা— দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে নয়, বর্ণালি মাপার যন্ত্র দিয়ে। কাজটা কঠিন, কিন্তু জানসেন তো গ্রহণের সময় ঝড়ের জায়গাগুলি দেখে নিয়েছেন। সূর্যের গায়ের ঝড় কতক্ষণ ধরে চলে, তার উত্তর কারও জানা ছিল না। জানসেন ভাবলেন যে, ওই ঝড় যদি পরের দিনও ওই জায়গায় থাকে, তা হলে এরকম একটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

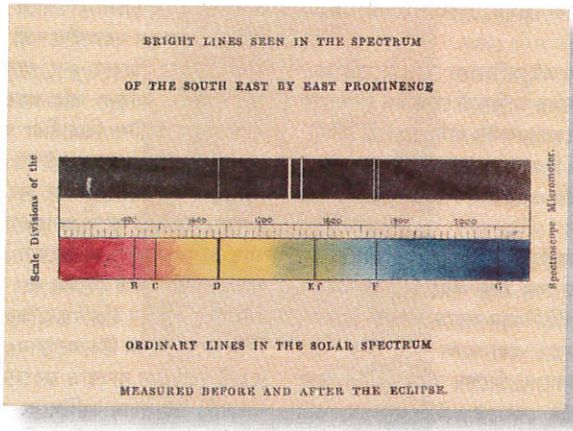

পোগসনের আঁকা বর্ণালিরেখা। নীচে সাধারণ অবস্থায় সূর্যের বর্ণালি, হলুদ অংশে কালো দাগটি (D) সোডিয়ামের চিহ্ন। ওপরে, গ্রহণের সময় বর্ণালি (সাদা-কালোয় আঁকা), বাঁদিকে প্রথম দাগটি হিলিয়ামের স্বাক্ষর বহন করছে

নরম্যান লকইয়ার ছিলেন লন্ডনের সামরিক অফিসের একজন কেরানি। একবার এক শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দূরবিনে চোখ রাখার পর থেকে তাঁর জীবন একেবারে অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল।

সেই রাতে তাঁর খুব ভাল ঘুম হয়নি। ভোরে উঠে যন্ত্রপাতি ঠিক করে যখন সূর্যের বাইরের অংশে তাক করলেন, দেখলেন, তাঁর ধারণাই ঠিক, তিনি আগের দিনের মতো উজ্জ্বল রেখার বর্ণালি দেখতে পেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন বিজয়ওয়াড়া থেকে প্যারিসে (তখন সবেমাত্র কয়েক মাস হল ভারত-ইউরোপের টেলিগ্রাফ লাইন বসেছে)। তবে এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি প্রায় মাসখানেক ধরে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করতে লাগলেন। পরে ১৯ সেপ্টেম্বর নাগাদ তিনি বিশদে একটি চিঠি পাঠালেন, যে-চিঠি প্যারিসে পৌঁছল ২৪ অক্টোবর। এই চিঠিতে এবং তার আগের টেলিগ্রামে নতুন কোনও গ্যাসের উল্লেখ ছিল না।

এদিকে ২০ অক্টোবর লকইয়ার তাঁর নতুন যন্ত্র হাতে পেয়ে সেই দিনই পর্যবেক্ষণ করতে বসে গেলেন। তিনিও জানসেনের মতো উজ্জ্বল রেখার বর্ণালি দেখতে পেলেন এবং পরের দিন একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন প্যারিসে। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন যে, রিপোর্টে জানসেনের নাম উল্লেখ করবেন, পরে কী ভেবে সেটা কেটে বাদ দিয়ে দিলেন। মজার কথা হল এই যে, তাঁর টেলিগ্রামটি ২৪ অক্টোবর পৌঁছয়, আর ঠিক সেদিনই ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো জানসেনের টেলিগ্রামটিও আসে। এরকম কাকতালীয় ব্যাপার সচরাচর ঘটে না, তাই ফরাসি অ্যাকাডেমি জানসেন ও লকইয়ারকে সূর্যের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করার এই নতুন পদ্ধতির যুগ্ম আবিষ্কারক বলে ঘোষণা করল। লক্ষণীয় যে, তাতে হিলিয়াম বা নতুন কোনও গ্যাসের উল্লেখ ছিল না।

বহু বছর পর লকইয়ার তাঁর ১৮৯৬ সালে লেখা প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, পোগসনের রিপোর্টের একটা লাইন তাঁকে খুব ভাবিয়েছিল। সেটা হল, হলুদ রেখাটা সোডিয়ামের চিহ্ন না-ও হতে পারে। অবশ্য পোগসনের সেই রিপোর্ট কোনও বিজ্ঞান-জার্নালে প্রকাশিত হয়নি, যদিও অন্য সকলের কথা প্রকাশ করা হয়েছিল। পোগসন যখন তাঁর রিপোর্ট লিখে নিজের উদ্যোগে মাদ্রাজে ছাপানোর ব্যবস্থা করছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী কলেরায় মরণাপন্ন।

এই সময় লকইয়ারের সমালোচনা করে হাগিন্স বললেন যে, লকইয়ার নিজে বিশেষ কিছুই করেননি। কারণ, জানসেনের আবিষ্কারের কথা তাঁর অজানা ছিল না। এতে রেগে গিয়ে লকইয়ার জানান যে, জানসেনের পরীক্ষার ফল তাঁর কোনও কাজেই লাগেনি।

যাই হোক, নরম্যান লকইয়ার তাঁর প্রবন্ধে জানসেনের বদলে পোগসনের পর্যবেক্ষণের কথা বড় করে লিখলেও, কোনও এক রহস্যময় কারণে পোগসনের নাম হিলিয়ামের আবিষ্কারের ইতিহাস থেকে মুছে গেল চিরতরে। আর জানসেন কোনও নতুন গ্যাসের চিহ্ন না দেখেও হয়ে গেলেন হিলিয়াম আবিষ্কারের যুগ্ম আবিষ্কারক। হয়তো লকইয়ার আর জানসেনের দুটো চিঠি একসঙ্গে প্যারিসে পৌঁছনোর নাটকীয়তাই এর জন্য দায়ী।

১৮৬৮ সালে এই নতুন গ্যাসের চিহ্ন দেখতে পাওয়ার পর তাকে পৃথিবীর বুকে খোঁজার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রথমে অনেকে মনে করেছিলেন যে, এটি হয়তো হাইড্রোজেনেরই কোনও জাতভাই বিশেষ। লকইয়ারের মনে হয়েছিল, এটি সত্যিই একটি নতুন গ্যাস। সূর্যে এই অপার্থিব গ্যাসের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে, সূর্যের গ্রিক শব্দ 'হিলিওস' থেকে তিনি

১৮৬৮ সালে সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণের সময় গুন্টুরে মেজর টেন্যান্টের তাঁবু, তাঁর সহকারী সার্জেন্ট ফিলিপস-এর আঁকা ছবি

এর নামকরণ করেন হিলিয়াম (রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' বইয়ে এর নাম দিয়েছিলেন 'সৌরক'।) এতে আবার অনেক বিজ্ঞানী খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। এই গ্যাস নিয়ে রাসায়নিক গবেষণায় লকইয়ারকে যিনি সাহায্য করেছিলেন, সেই এডওয়ার্ড ফ্র্যাংকল্যান্ড তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এদিকে আবার কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এমন কয়েকটি মহাজাগতিক গ্যাস আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন, পৃথিবীতে যেগুলোর চিহ্নমাত্র নেই। পরবর্তীকালে এই সব গবেষণা ভুল প্রমাণিত হল। এইসব কারণে সে দিনের বিখ্যাত রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্ডেলিফ জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের এই পদ্ধতিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

শেষে ভারত থেকে দেখা সেই সূর্যগ্রহণের সাতাশ বছর পর পৃথিবীতে হিলিয়াম খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। ১৮৮৭ সালে এক আমেরিকান ভূতত্ত্ববিদ ইউরেনাইট নামে এক পদার্থের মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাসের আধিক্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। এর আগে এরকম মাটির নীচ থেকে পাওয়া কোনও পদার্থে এভাবে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়নি। এই নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁর সন্দেহ হল, এর মধ্যে অন্য কোনও গ্যাসও থাকতে পারে। এই খবর কোনওভাবে এসে পৌঁছয় কেমব্রিজের লর্ড র‍্যালের কাছে, যিনি এই সূত্র ধরে একটি নতুন গ্যাস আবিষ্কার করলেন। এর নাম দেওয়া হল 'আর্গন'। দেখা গেল সাধারণত এই গ্যাসের সঙ্গে অন্য কোনও পদার্থের বিক্রিয়া হয় না, তাই এটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই ধরনের গ্যাসগুলিকে এখন আমরা বলি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। র‍্যালের সহকর্মী উইলিয়াম র‍্যামসের তখনই মনে হয়েছিল যে, হয়তো আর্গনই একমাত্র নয়, এরকম আরও গ্যাস থাকতে পারে, যেগুলো খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ১৮৯৫ সালে তিনি ক্লেভিয়াইট নামে একটি পদার্থে আর-একটি নতুন গ্যাস খুঁজে পেলেন। এবং এর বর্ণালিতে পাওয়া গেল একটি উজ্জ্বল হলুদ আলোর রেখা, ঠিক যেমনটা লকইয়ার আর পোগসন বলেছিলেন। আর সন্দেহ রইল না যে, এই গ্যাসটিই সেই হিলিয়াম।

উইলিয়াম র‍্যামসে

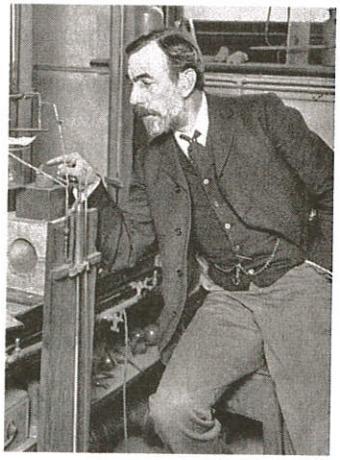

১৮৬৮র সূর্যগ্রহণের পর লকইয়ার ফ্রান্সিস টেন্যান্ট লখনউতে নবাবের মানমন্দিরে ঢুকে তাঁর দূরবিন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পান। এরপর তাঁর আর মন টিকল না সৈন্যদলে, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মাদ্রাজের মানমন্দিরের অধিকর্তা হয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েই পড়ে রইলেন।

হিলিয়াম নিয়ে গবেষণা করে গেলেও, জানসেন পরের দিকে অন্য বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তিনি সেবার গুন্টুর থেকে কলকাতা হয়ে সিমলায় গিয়ে সূর্যের ঝড়ের বর্ণালি মাপার একটি নতুন যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, যাকে বলা হয় স্পেকট্রোহিলিওস্কোপ। তারপর তিনি ফোটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। তিনি কোল্ট রিভলভারের ডিজাইনের মতো একটি ক্যামেরা তৈরি করে তার সাহায্যে সূর্যের পরপর কয়েকটি ফোটো তোলেন। এই যন্ত্র থেকেই একসময় মুভি ক্যামেরার উদ্ভব হয়। ফ্রান্সে লুমিয়ের ভাইরা এরপরই চলমান ছবি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেন। ১৮৯৫ সালে ফোটোগ্রাফি সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সভায় লুমিয়ের ভাইদের তৈরি একটি চলচ্চিত্রে দেখা যায়, জানসেন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছেন অন্যান্যদের সঙ্গে। সেই বছরই হিলিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছিল গবেষণাগারে, কিন্তু জানসেন তখন সেই গবেষণার ধারা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন।

মেজর টেন্যান্ট পরের দিকে কলকাতা টাঁকশাল-এর মাস্টার হিসেবে কাজ করে দেশে ফিরে যান এবং একসময় রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি মনোনীত হন। জন হার্শেল বেঙ্গালুরুতে কয়েক বছর থেকে, দেশে ফিরে যাওয়ার পর বিজ্ঞান-গবেষণা থেকে অবসর নেন।

পোগসন ১৮৯১ সালে তৎকালীন মাদ্রাজে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। হিলিয়াম আবিষ্কারের শেষ অঙ্ক দেখে যাওয়ার আর সুযোগ পাননি। ইতিহাসে উপেক্ষিতই থেকে গেলেন তিনি। আর, 'সোনার কেল্লা'-র মুকুলের মতো আসল ডাক্তার হাজরা যে কে, সেটা যেন আমরাও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

লেখক একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, বেঙ্গালুরুর রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গবেষণারত

লকইয়ার তাঁর প্রবন্ধে জানসেনের বদলে পোগসনের পর্যবেক্ষণের কথা বড় করে লিখলেও, কোনও এক রহস্যময় কারণে পোগসনের নাম হিলিয়ামের আবিষ্কারের ইতিহাস থেকে মুছে গেল চিরতরে।